ভারতীয় দর্শনচর্চার প্রেক্ষিতে শ্রী অরবিন্দের সৃষ্টিতত্ত্ব

নিতাই চন্দ্র দাস

সংক্ষিপ্তসার: শ্রীঅরবিন্দের মতে জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়া দ্বিমুখী। একদিকে অবরোহণ, অন্যদিকে আরোহণ। আরোহণ বা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূল হল জড় প্রকৃতি এবং চরম পরিণতি হল চিৎব্রহ্ম। কারণ সংবরণ বা নিগূহন প্রক্রিয়ার মূল হল চিৎব্রহ্ম এবং চরম পরিণতি হল জড় প্রকৃতিতে চিদাত্মার নিগূহন এবং নিগূহনে যা মূল। তাই আরোহন প্রক্রিয়ার চরম পরিণতি একই ভাবে নিগূহনে যা চরম পরিণতি বিবর্তনে তা মূল, এটাই শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টি তত্ত্বের মূল। শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টির বিবর্তনমূলক দিক বেদান্তের সৃষ্টির বর্ণনার সঙ্গে কম-বেশী মিলে যায়। এক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে শ্রীঅরবিন্দের শব্দ ব্যবহার, ধারণা ও অন্তর্দৃষ্টির দিক দিয়ে। বেদান্তে সৃষ্টি হল অবিদ্যার ফল। শ্রীঅরবিন্দের মতে অবিদ্যা হল দিব্য চৈতন্যের শক্তি। অবিদ্যা স্বতন্ত্র শক্তি নয়, এ হল দিব্য চৈতন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ দিব্যজ্ঞানের অভাব নয়। এক দিক দিয়ে (one extreme) এ হল পরম দিব্য চৈতন্য এবং অন্য দিক দিয়ে এ হল একটি পূর্ণ অবিদ্যারই সম্ভাবনা। অবিদ্যা এই দুই এর মাঝখানে থাকে এবং এ হল সৃষ্ট জগতের পরিধি। এইভাবে পরমসত্তা আংশিকভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং নিজেকে অবিদ্যাতে অবরোহণ করতে সংকল্প করেন এবং এটাই হল সৃষ্টি। শ্রীঅরবিন্দের মতে বিবর্তনমূলক অগ্রগতি (প্রসার) হল ত্রিমুখী প্রণালী। বিবর্তনমূলক প্রণালীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সমন্বয়। এই জগতকে পুরাপুরি বোঝার জন্য মায়া সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের মতকে জানতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ জগৎকে বাস্তব বলেছেন এবং এর একটি মর্যাদা দিয়েছেন।

মূলশব্দ: অভিব্যাক্তি,অবরোহণ, আরোহণ, অবিদ্যা, বিশ্বভুবন , সংবরণ, সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্ম, অখণ্ডস্বরূপ, প্রজ্ঞা, সঙ্কল্প, অনাদি, আত্মসংবিত, বিশ্বলীলা, আত্মনিগূহন, ত্রিমুখী, অতিমানস, পরমার্থ, স্বরূপ পরিণাম ,বিরূপ পরিণাম।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন চর্চা সমকালীন ভারতীয় দর্শনচর্চার ইতিহাসে এক নবদিগন্তের উদ্ঘাটন করে,তাঁর দর্শনের গূঢ় তত্ত্বগুলি মানব সমাজ ও সংস্কৃতির উপর প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষ করে "মনুষ্য জীবনের দিব্যজীবনে, এবং জড়প্রকৃতির দিব্যপ্রকৃতিতে রূপান্তরের দার্শনিক ভিত্তি ও যুক্তি এতে পাওয়া যায়; মর্ত্যভূমি ও স্বর্গভূমির ব্যবধান ঘুচে যায়; দৃশ্যমান জগতের প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি বেদনা, প্রতিটি ভাবনা, প্রতিটি প্রবৃত্তি, প্রতিটি কল্পনা ও প্রতিটি ঘটনা পারমার্থিক তাৎপর্য্যে গৌরবান্বিত হয়। বিশ্বের থেকে দুঃসহ বিচ্ছিন্নতাবোধের স্থলে আসে বিশ্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য নিবিড় সংযোগ বা আত্মীয়তা-বোধ। বর্তমান যুগের প্রধান ব্যাধি হল বিশ্বের সঙ্গে অনাত্মীয়তার পীড়া ও নিঃসঙ্গতার গভীর দুঃখ। এই পীড়া ও দুঃখ যে আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিষময় ফল সেটি শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টি ও অভিব্যক্তি ব্যাপার সমন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলি অনুধাবন করলে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়।"[১] এই ভাবে শ্রীঅরবিন্দের প্রধান দার্শনিক তত্ত্বগুলি মানুষের জীবন তথা সমাজ ও সংস্কৃতিতে অনুস্যূত। যাই হোক শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দর্শনে কিভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন তা উক্তস্থলে খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হল।

শ্রীঅরবিন্দের মতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই একমাত্র সৎবস্তু। এখন "একমাত্র আত্মাই আছেন এই যদি সত্য হয় , তাহলে এও সত্য যে যা কিছু দেখছি সমস্তই আত্মা। আত্মা ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে যদি স্বয়ংপ্রজ্ঞ ও সর্বময় বলে জানি, যদি তাঁকে অনীশ্বর খিলবীর্য কঞ্জুকাবৃত পুরুষ বলে না মনে করি, তাহলে স্বীকার করতে হবে তার এই বিশ্ববিসৃষ্টির মূলে আছে একটা সুসংগত ও স্বাভাবিক হেতু প্রত্যয়। তখন সেই হেতুকে আবিষ্কার করাই হবে মানুষের পুরুষার্থ।"[২]

শ্রীঅরবিন্দের মতে আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্রে এই বিশ্বভুবন হল সর্বান্তর্যামী এক চিৎশক্তির বিসৃষ্টি, তিনি হলেন রহস্যময় সত্তা। অর্থাৎ তাঁর মতে "সৃষ্টির মূল যে সত্তা তিনি রহস্যময় এবং তাঁর এই সৃষ্টি রূপ লীলা অর্তক্য রহস্য, বিশ্বচরিতের আদিলীলা আজও আমাদের কাছে অর্তক্য রহস্য, সে লীলার প্রত্যক্ষ গোচর পরিণামকে বাস্তব প্রয়োজনের দিক দিয়ে বিচার করতে পারি।

তাঁর প্রবৃত্তির অপরিহার্যতাকে কোন কিছুতেই প্রমাণ করতে পারি না।"[৩] অর্থাৎ চিৎশক্তি তিনি নিজে অপ্রত্যক্ষ গোচর তাঁর প্রবৃত্তির উদ্দেশ্যও প্রমাণাতীত কিন্তু তার লীলা রূপ প্রবৃত্তির পরিণাম বা সৃষ্টির স্তরগুলি প্রত্যক্ষ গোচর। তাই তাঁর মতে সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়াই রহস্যময়। তিনি স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে — "নির্বিশেষ বস্তু স্বরূপ কোন্ দুর্বোধ্য উপায়ে বিশেষিত হল, বস্তুর বিচিত্র শক্তিগুণ ও ধর্ম কি করে স্ফুরিত হল, তাদের স্বরূপ কি তাৎপর্যই বা কি, এসমস্তই আমাদের কাছে অনাদি রহস্যগুণ্ঠনে ঢাকা থেকে যায়।"[৪]

সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার রহস্যগুণ্ঠনে আবদ্ধ হলেও সৃষ্টি প্রাপ্ত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির প্রবর্ত্তক কে সে বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা খুবই প্রাচীন। শ্রীঅরবিন্দও বিভিন্ন অভিমত খণ্ডন পূর্বক স্বকীয় অভিমত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে জীব সৃষ্টির প্রযোজক হতে পারে না। তিনি বলেন অতিপ্রাচীন কালে অতিকায় বিগ্রহ এর কল্পনা মানুষের সমস্ত কল্পনাকে ছাপিয়ে গেছে। জীবত্বের মহিমাকে খর্ব না করে কেউ সেই অতিকায় পুরুষকে বিশ্বস্রষ্টার আসনে প্রতিষ্ঠা করার বাসনা পোষণ করতে পারেন,"কেননা জড় প্রকৃতির আড়ালে চিৎস্বরূপের আত্মনিগূহনের মধ্যে তাঁর চিদ্রূপিনী স্বরূপশক্তির যে লীলা, তাতে ব্যষ্টিপুরুষেরও যে সায় আছে, একথা অনস্বীকার্য।.... কিন্তু তা হলেও জগৎকে ব্যষ্টিমনের সৃষ্টি অথবা তার চিত্তনাট্যের রঙ্গভূমি বলতে পারি না; কিংবা এ যে শুধু জীবের অহমিকার সিদ্ধি-অসিদ্ধির লীলা ক্ষেত্ররূপে কল্পিত, এও মানতে পারিনা, ব্যক্তির চাইতে বিশ্ব বড়, ব্যক্তি বিশ্বেরই আশ্রিত — এই বোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত হলে ব্যক্তি প্রাধান্যের সিদ্ধান্তে বুদ্ধির আর কোনও সায় থাকে না। ব্রহ্মান্ডের লীলা এতই বিরাট যে, তাকে জীবশাসিত বলে কল্পনা করা অসম্ভব। একমাত্র বিশ্বশক্তি বা বিরাট পুরুষই বিশ্বের স্রষ্টা এবং ভর্তা হতে পারেন"।[৫]

. কোন কোন দার্শনিক মনকে জগতের স্রষ্টা বলে মনে করেন, তাঁদের মতে মন বিশ্বরূপ এবং বিশ্বাতীতের মাঝে একমাত্র মধ্যস্থ। তাঁদের মধ্যে এক ধরণের অভিমত লক্ষ্য করা যায় যে, জগৎ কেবল মন, ভাব বা বিজ্ঞানের খেলা, তত্ত্ববস্তুর সঙ্গে জগতের কোনরূপ সম্পর্ক নেই, ইত্যাদি। তাঁদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "স্রষ্টৃবিজ্ঞান বস্তুত সম্ভূত — বিজ্ঞান অর্থাৎ তা চিৎশক্তির সেই দিব্য সামর্থ্য বা তত্ত্বের দ্যোতক, তত্ত্ব হতে জাত এবং তত্ত্বধর্মী — যা শূন্য কি অতত্ত্বের বিজৃম্ভন নয়, বা অবস্তুর জাল বুনে চলেনি অসতের মধ্যে। এ এক চিন্ময় পরামার্থতত্ত্ব, যা নিজের অক্ষয় অক্ষোভ্য স্বরূপধাতুকেই বিচ্ছুরিত করছে বিচিত্র বিপরিণামে। অতএব এ জগৎ বিশ্বমনের একটা বিকল্প নয় শুধু যা মনের অতীত, এ তারই আত্মরূপায়ণ।"[৬]

এক অদ্বিতীয় পরমার্থ সদ্বস্তু হতেই এই বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি। যেহেতু জগতের সকল বস্তুই এই একই পরমার্থ সদ্বস্তুর অন্তরবর্তী সেহেতু কোনো বাহ্যশক্তির প্রভাবে জগৎ সৃষ্টি হয় একথা বলা যায় না। কারণ, তাতে পরমার্থ তত্ত্বের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয়। তাহলে জগৎসৃষ্টির মূল প্রবর্তক কী ? এখানেই শ্রীঅরবিন্দ বলেন যদৃচ্ছা সৃষ্টির প্রবর্তক হতে পারে না । এ প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য — "যদি বলি বিশ্বে যা কিছু ঘটছে, আত্মা তার সম্পূর্ণ নিষ্পক্ষ উপদেষ্টা শুধু — যা ভূত এবং ভব্য তাদের তিনি ঈশ্বর নন, কেবল ভ্রুক্ষেপহীন ঔদাসীন্যে চেয়ে আছেন তাদের দিকে এবং তাতেই বিশ্ব চলছে; তাহলেও মানতে হবে, এই বিসৃষ্টির মূলে আছে কারও সঙ্কল্প, কারও বিধৃতি — নইলে শুধু যদৃচ্ছা বশে এ চলছে কেমন করে ? কিন্তু ব্রহ্ম সর্বময় হলে এই সঙ্কল্প ও বিধৃতি তাঁর ছাড়া আর কারও হতে পারে না।"[৭]

উক্ত স্থলে আরও একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সর্বময় ব্রহ্মের সঙ্কল্পকে যদি সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বা জগৎ আবির্ভাবের অপরিহার্য নিমিত্ত কারণ বলে স্বীকার করা হয় তাহলে কামনাকে জগৎ সৃষ্টির প্রবর্তক বলে স্বীকার করা যাবে না। যেহেতু সর্বময়, সর্বগত, এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আপ্তকাম, তাঁর কোনো কামনা থাকতে পারে না। এই কারণে কামনা অতৃপ্তি এবং অপূর্ণতার সূচক। এই কামনা অহন্তার ধর্ম — এই অহন্তা আবার এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ারই একটি অঙ্গ। তাই কামনা সর্বগত ব্রহ্মের ধর্ম হতে পারে না। উক্ত প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন "ব্রহ্মের সর্বসংবিৎ জড়ত্বের মূঢ়তায় নিজেকে যদি সংবৃত করতে চেয়ে থাকে, তাহলেও তাঁর মূলে আছে কোনও অতৃপ্ত বাসনার তাগিদ নয় — কিন্তু নতুন ভঙ্গিমায় তাঁর আত্মবিসৃষ্টির কোনো সঙ্কল্প।"[৮]

তবে শ্রীঅরবিন্দ বলেন বেদান্তের দুটি প্রধান অভ্যুপগম যে রয়েছে তা স্বীকার করে নিতে হয়। সেই দুটির অভ্যুপগম হল অপূর্ণ ও প্রমাদগ্রস্ত। তিনি আরো বলেন, ব্রহ্মই হল একমাত্র সত্য, এবং আত্মভাব ও জগৎভাব সম্পর্কে আমাদের যে প্রকৃত মনের সংস্কার তা হল অবিদ্যা কূলষিত।

সুতরাং এই আলোচনা থেকে এই বিষয়ের সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জগৎ সৃষ্টির মূলে হল সর্বগত চিৎব্রহ্মেরই সঙ্কল্প — অন্য কিছুই নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল যে, ব্রহ্মেরই সঙ্কল্প হতে জগতের সৃষ্টি হয় কীভাবে ? শ্রীঅরবিন্দের মতে জগতের এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া দ্বিমুখী। একদিকে অবরোহণ, অন্যদিকে আরোহণ। অবরোহণের অপর নাম সংবরণ বা নিগূহন এবং আরোহণের অপর নাম বিবর্তন বা অভিব্যক্তি এই অবরোহণ এবং আরোহণ প্রক্রিয়া চলে সত্তার আটটি স্তরের মধ্যে। প্রথমে ক্রমোচ্চ স্তর থেকে নিম্নতর স্তরে সদ্-ব্রহ্মের নিগূহন ঘটে তার পর ক্রমে ক্রমে ক্রমোচ্চ স্তরে তার অভিব্যক্তি ঘটে। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেন— "পরমার্থের এই অবতরণের প্রকৃতি হল আত্মনিগূহন। বিসৃষ্টিতে নেমে এসেছেন তিনি ধাপে ধাপে, আবরণের পর আবরণ দিয়ে তিনি নিগূহীত করেছেন নিজেকে। অতএব তাঁর আত্মবিবৃত্তি স্বভাবতই ধরবে উদয়নের রূপ। আর দুইএরই অভিব্যক্তি হবে পর্বে পর্বে।"[৯]

শ্রীঅরবিন্দের উক্ত অভিমত থেকে একথাই প্রতিপাদিত হয় যে, অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ায় বিবর্তনের পূর্ব এবং অনিবার্য শর্ত হল সংবরণ। যাইহোক, এই সংবরণ প্রক্রিয়ায় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম মানস, প্রাণিক ও জড়ীয় স্তরে নিগূর্হিত হন। এই স্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম কিভাবে জড়স্তরে নিগূর্হিত হন ? এর উত্তরে বলা যায় যে, ব্রহ্মের অপরিসীম শক্তির দ্বারাই তিনি নিজেকে জড়ীয় স্তরে নিগূহিত করেন। প্রসঙ্গত বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে , শ্রী জিতেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার তাঁর "শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে অভিব্যক্তির স্বরূপ" নামক প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দের উক্ত অভিমত উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন— "ব্রহ্মের শক্তি নির্বাধ ও অঘটনঘটনপটীয়সী। এই শক্তির দ্বারাই চৈতন্যধর্মীব্রহ্ম আপাতত অচেতন জড়ে ও কিঞ্চিৎ চেতন প্রাণে নিগূহিত হতে পারেন।"[১০]

পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে যে, যিনি দেশকালতীত স্বয়ং সম্পূর্ণ, এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা তিনি কেনই বা জড় প্রকৃতিতে নিগূহিত হবেন, আবার কেনই বা মানব মনের মধ্য দিয়ে নিজের স্বরূপে ফিরে যাবেন ? অর্থাৎ যিনি দেশকালতীত স্বয়ংস্পূর্ণ সত্তা তাঁর অবরোহণ এবং আরোহণ রূপ জটিল প্রক্রিয়ার প্রয়োজন কি ? এইরূপ প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দ নিজেই উত্থাপন করে নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন — " 'ব্রহ্ম অনন্ত নির্বিশেষ নিরঞ্জন অপ্রয়োজন অকাম হয়েও কেন চিৎশক্তিকে বিচ্ছুরিত করলেন বিশ্বরূপের বিসৃষ্টিতে ?' ..... তিনি স্ব-তন্ত্র, অতএব সৃষ্টির যোগ্যতা থাকলেও তার দায় তাঁর নাই। স্পন্দবৃত্তি অথবা স্পন্দহীন নিত্যস্থিতি, সম্ভূতি অথবা আত্মনিরুদ্ধ অসম্ভূতি দুইই যদি তাঁর স্বেচ্ছাধীন হয়, তাহলে তাঁর এই স্পন্দ ও সম্ভূতিলীলার একমাত্র কারণ হতে পারে — আনন্দের আবরণ উচ্ছ্বাস"[১১]। "আত্মস্বরূপের আনন্দস্পন্দকে অনন্ত রূপ বৈচিত্র্যের উৎসারণে সম্ভোগ করাই তাঁর বিশ্বব্যাপিনী সৃষ্টিলীলার একমাত্র তাৎপর্য।"[১২] এক্ষেত্রে বলা যায় যে, বিশ্বে যা রূপায়িত হয়েছে, তা হল সৎ-চি-আনন্দের অখন্ড ত্রয়ী। বেদান্তীরা তাঁকেই বলেন সচ্চিদানন্দ। আর এই চিৎস্বভাবে আছে বিসৃষ্টি বা আত্মরূপায়ণের এক দিব্য সামর্থ্য । সুতরাং এ জগৎকে বলা হয় সচ্চিদানন্দের বিভূতি।

যাইহোক, আরোহণ বা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূল হল জড় প্রকৃতি এবং চরম পরিণতি হল চিৎব্রহ্ম। কারণ সংবরণ বা নিগূহন প্রক্রিয়ার মূল হল চিৎব্রহ্ম এবং চরম পরিণতি হল জড় প্রকৃতিতে চিদাত্মার নিগূহন এবং নিগূহনে যা মূল। তাই আরোহণ প্রক্রিয়ার চরম পরিণতি একই ভাবে নিগূহণে যা চরম পরিণতি বিবর্তনে তা মূল, এটাই শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টিতত্ত্বের মূল। কেননা তাঁর মতে সংবরণ হল বিবর্তনের মূল ও অপরিহার্য শর্ত। যাই হোক, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় জড় প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বিকাশ ঘটে প্রাণের, কেননা জড় প্রকৃতিতে প্রাণশক্তিই নিগূহিত হয়ে থাকে এবং শ্রীঅরবিন্দের মতে শূন্য থেকে কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না। একই ভাবে প্রাণ থেকে বিকাশ ঘটে মনের, যেহেতু 'মন' প্রাণেই নিগূহিত। এই জড়, প্রাণ ও মন নিয়েই জীবসত্তা বা জীবের জৈব প্রকৃতি। কিন্তু বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মনের বিকাশই জীবের চরম বিকাশ নয়। সমগ্র সত্তাকে এক অখন্ড

চেতনার স্তরে উন্নীত করাই আমাদের সাধনার চরম লক্ষ্য।

প্রসঙ্গত বলা যায়, শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টির বিবর্তন মূলক দিক বেদান্তের সৃষ্টির বর্ণনার সঙ্গে কম-বেশী মিলে যায়। এক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে শ্রীঅরবিন্দের শব্দ ব্যবহার, ধারণা ও অন্তর্দৃষ্টির দিক দিয়ে। বেদান্তে সৃষ্টি হল অবিদ্যার ফল। অবিদ্যা থেকে আমরা জগৎকে পাই এবং আমাদের আত্মা হল একমাত্র সত্য। এ হল পরম সত্যের প্রকৃত স্বরূপ ভুলে যাওয়ার ফল। বেদান্তে বলা হয় যে প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি কখনও ছিল না এবং এই বিশ্বপ্রপঞ্চ হল খেলাচ্ছলে আনন্দদায়ক ক্রিয়া যাকে বলা হয় লীলা।

কম-বেশী একই ভাবে শ্রীঅরবিন্দ সৃষ্টির বর্ণনা করেন। এই ভাবে যে সৃষ্টি তা হল অবিদ্যাতে পরমসত্তার অবরোহণ। শ্রীঅরবিন্দের মতে অবিদ্যা হল দিব্য চৈতন্যের শক্তি। অবিদ্যা স্বতন্ত্র শক্তি নয়, এ হল দিব্য চৈতন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ দিব্যজ্ঞানের অভাব নয়। এক দিক দিয়ে (one extreme) এ হল পরম দিব্য চৈতন্য এবং অন্য দিক দিয়ে এ হল একটি পূর্ণ অবিদ্যারই সম্ভাবনা। অবিদ্যা এই দুই এর মাঝখানে থাকে এবংএ হল সৃষ্ট জগতের পরিধি। এইভাবে পরমসত্তা আংশিকভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং নিজেকে অবিদ্যাতে অবরোহণ করতে সংকল্প করেন এবং এটাই হল সৃষ্টি।

কিন্তু প্রথমত: যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে ওঠে তা হল — পরমসত্তা কেন এই জগতকে অবিদ্যা থেকে সৃষ্টি করতে চান ? তিনি কি জ্ঞান থেকে তা সৃষ্টি করতে পারেন না ? এবং যদি তিনি অবিদ্যা থেকেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তবে কি আমরা বলতে পারি না যে তাঁর শক্তির একটা সীমা আছে ? শ্রী অরবিন্দ এরকম একটা সন্দেহের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। তাই তিনি বলেন যে পরমসত্তা তার নিজের জ্ঞানের পূর্ণতা থেকে এই জগৎ সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তা হল উচ্চতর সৃষ্টি যা কেবল মুনি ঋষিগণ দেখতে ও উপলব্ধি করতে পারেন। সৃষ্টির প্রশ্নে সাধারণভাবে নিম্ন জগতের — সৃষ্টির কথাই বলা হয় যে জগতে আমরা বাস করি ও বিচরণ করি। এই সৃষ্টি অবিদ্যার দ্বারাই হয় অসীম চৈতন্য এর অসীম কাজে শুধুমাত্র অসীম ফলই উৎপন্ন করে।

এরূপ জগতের ধারণা অদ্বৈত বেদান্তের ধারণা থেকে শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সূচিত করে যেক্ষেত্রে সৃষ্টির বর্ণনা জগতকে স্বরূপতঃ অবাস্তব করে তোলে না (যেক্ষেত্রে অদ্বৈতমতে জগৎ অবাস্তব)। শ্রীঅরবিন্দ জগৎকে বাস্তব বলেছেন এবং এর একটি মর্যাদা দিয়েছেন। এই জগতকে পুরাপুরি বোঝার জন্য মায়া সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের মতকে জানতে হবে।

মানুষের মনের সঙ্গে অখণ্ড চেতনার সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজন 'ত্রিপর্বা রূপান্তর' অর্থাৎ তিনটি পর্বের রূপান্তর। প্রথম পর্বের রূপান্তর হল চৈত্যসত্তার রূপান্তর। দ্বিতীয় পর্বের রূপান্তর হল চিন্ময় রূপান্তর এবং তৃতীয় পর্বের রূপান্তর হল অতিমানসিক রূপান্তর। চৈত্যসত্তার রূপান্তর বলতে বোঝায় চৈত্যসত্তার গুণ্ঠন মোচন বা প্রচ্ছন্নতা দূরীকরন। চৈত্যসত্তা বলতে বোঝায় মানুষের দেহ, প্রাণ ও মন অতিরিক্ত যে অন্তরতম মূল সত্তা বা শাশ্বত সত্তা তাকেই। মানস বিবর্তনের পূর্বে চৈত্যসত্তা নিজেকে প্রচ্ছন্ন ও স্তিমিত করে রাখে। এই চৈত্যসত্তার আবরণ মোচনই হল অর্থাৎ প্রচ্ছন্নতা দূরীকরণই হল চৈত্যসত্তার গুণ্ঠনমোচন। এই গুণ্ঠন মোচনের জন্য প্রয়োজন চৈত্যসত্তার সঙ্গে বহিঃস্থসত্তার সাক্ষাৎ অনুভবের সম্বন্ধ স্থাপন করা। চৈত্যসত্তার সঙ্গে বহিঃস্থ সত্তার অপরোক্ষ অনুভবের সম্বন্ধ স্থাপন হয় চিত্তসাধনা, ভক্তি সাধনা এবং সঙ্কল্প সাধনার দ্বারা। এটাই হল প্রথম পর্বের রূপান্তর।

দ্বিতীয় পর্বের রূপান্তর হল চিন্ময় রূপান্তর। প্রথমপর্বের রূপান্তরে অন্তরতম — শাশ্বত সত্তার অবগুণ্ঠন মোচনের মাধ্যমে মন যে অন্তর্মুখী হয় তার সম্পূর্ণতা দেখা দেয় এই চিন্ময়রূপান্তর পর্বে। এই রূপান্তরের স্তরে চলে ক্রমিক আরোহণ। এই আরোহণের লক্ষ্য হল অতিমানস। অর্থাৎ প্রকৃত মনের স্তর থেকে অতিমানসে উত্তরণের জন্য কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে উত্তরণ ঘটে। সেগুলি হল প্রথমে উত্তরণ ঘটে উত্তর মানসে, তারপর উত্তরমানস হতে প্রভাস মানসে, প্রভাস মানস হতে বোধি মানসে এবং বোধি মানস হতে অধিমানসে। এই চারটি ধাপে রূপান্তর ঘটে দ্বিতীয় পর্বের রূপান্তরে।

তৃতীয় অর্থাৎ অন্তিম পর্বের রূপান্তর হল অতিমানসিক রূপান্তর, "চিন্ময় রূপান্তরকে স্থায়ী করার কথা বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

তার জন্য চাই অবিদ্যা কবলিত মানব প্রকৃতির আমূল রূপান্তর। তা সম্ভব একমাত্র অতিমানস শক্তিপাতের দ্বারা। এই শক্তিপাত ঘটে রূপান্তরের তৃতীয় পর্বে — অতিমানস রূপান্তরে। এই রূপান্তরের ফলে জীব আত্মজ্ঞানের অধিকারী হয়। তার অবিদ্যাক্লিষ্ট জীবনের অবসান ঘটে। আর এভাবেই জড়বিশ্বে ঘটে বিজ্ঞানমন মহাপুরুষের মহাআবির্ভাব।"[১৩] এই অতিমানসিক রূপান্তরের দ্বারা যে সত্তার আবির্ভাব ঘটে শ্রীঅরবিন্দ তাকে 'নসটিক সত্তা' বলে বর্ণনা করেছেন। তাই তিনি বলেন, "অতিমানস উত্তরায়ণের অভিযানে বহু বিজ্ঞানঘন পুরুষের জীবন যদি প্রকৃতির ঊর্ধ্বপরিণামের বাহন হয়, তবে তাতেই দিব্য জীবনের সত্য পরিচয় ফুটবে; কেননা সে জীবনায়ন হবে শাশ্বত দিব্যপুরুষের আত্মবিভূতি, — জড় প্রকৃতিতে চিন্ময় দিব্য জ্যোতি শক্ত ও আনন্দের অবন্ধ্য রূপায়নের সেই তো সূচনা আনবে। মানবের মনঃকল্পনার বাইরে এ জীবনের মহিমা, অতএব তাকে বলতে পারি চিন্ময় অতিমানবতার প্রকাশ।"[১৪]

এখন প্রশ্ন হলো যে, শ্রীঅরবিন্দের এই সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের যে তিনটি খুবই পরিচিত সৃষ্টিতত্ত্ব রয়েছে তাদের কোনটির মধ্যে মিল রয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব তিনটি হল নৈয়ায়িক সম্মত আরম্ভবাদ। সাংখ্যদর্শন সম্মত পরিণামবাদ এবং অদ্বৈতবেদান্তী সম্মত বিবর্তবাদ। পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এই বিষয়টি সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টিতত্ত্বকে কোন ভাবেই নৈয়ায়িক সম্মত আরম্ভবাদ বলা যাবে না। কারণ শ্রীঅরবিন্দের মতে এই জগতের সৃষ্টি কোন নতুন আরম্ভ নয় তা হল চিৎব্রহ্মের সঙ্কল্প বশতঃ তাঁর লীলা এবং সেই লীলা তাঁর নিজেরই বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। উক্ত স্থলে তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব সাংখ্য অভিব্যক্তিবাদের বা বিবর্তনবাদের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে পড়ে। কারণ প্রথমত সাংখ্য মতে এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অবস্থা হল প্রকৃতির সুপ্ত অবস্থার অভিব্যক্তি বা বহিঃপ্রকাশ, তেমনি শ্রীঅরবিন্দের মতেও সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর হল চিৎব্রহ্মেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি। দ্বিতীয়তঃ সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির দুই প্রকার পরিণামের কথা বলা হয়েছে। যেমন— স্বরূপ পরিণাম ও বিরূপ পরিণাম যার সঙ্গে তুলনীয় হল শ্রীঅরবিন্দের বিবর্তন এবং সংবর্তন প্রক্রিয়ায়।প্রকৃতির স্বরূপ পরিণামে যেমন সমগ্র জগৎ প্রকৃতিতে লীন হয় তেমনি বিবর্তন প্রক্রিয়ায় জড়, মন ইত্যাদি ক্রমে এক অখণ্ড চেতনায় বিলীন হয় ইত্যাদি। তৃতীয়ত: সাংখ্য এবং শ্রীঅরবিন্দ উভয় সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে সৃষ্টি হল সুপ্ত অবস্থার বহিঃপ্রকাশ বা, অভিব্যক্তি। কিন্তু সমস্যা হল এই যে, শ্রীঅরবিন্দের মতে সৃষ্টি কিন্তু চিৎব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি তিনি চেতন স্বরূপ। জড়ত্ব তাঁর লীলাবিলাস, তাঁর অসীমশক্তির দ্বারা সেই জড়ের মধ্যে চেতনা নিগূহিত। কিন্তু অন্যদিকে সাংখ্য পরিণামবাদ অনুসারে জগতের সৃষ্টি হল জড় প্রকৃতিরই পরিণাম, চেতনের পরিণাম নয়। আরও একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সাংখ্য দর্শন মূলত দ্বৈতবাদী। তাঁদের মতে চেতন পুরুষের সান্নিধ্যবশত প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয় আর তাঁর ফলে সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় চেতন পুরুষ নিষ্ক্রিয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে চেতন সত্তাই একাধারে কর্তা, কর্ম এবং কার্যস্থল। তাই তাঁর মতে, "তিনিই নটরাজ, তিনিই কবি, তিনিই স্রষ্টা-তাঁরই অফুরন্ত আনন্দোচ্ছ্বাস হিল্লোলিত হয়ে চলেছে রূপে-রূপে। আত্মরূপায়নের অহেতুক উল্লাসে নিজের মধ্যেই নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি অক্লান্ত ছন্দোলীলায়। এ আনন্দ মেলায় তিনিই নট, তিনিই নাট্য, তিনিই নাট্যরঙ্গ।"[১৫] এই চেতন সত্তাই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা, তাই তিনি অদ্বৈতবাদী। সুতরাং তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বকে সাংখ্য পরিণামবাদ বা অভিব্যক্তিবাদের সমতুল্য বলা যাবে না। আবার তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বকে অদ্বৈত বেদান্ত সম্মত বিবর্তবাদ রূপে গণ্য করাও যাবে না, কারণ অদ্বৈত মতে ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু , জগৎ হল মিথ্যা প্রতিভাসমাত্র । কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ জগৎকে সত্তার অন্তর্ভুক্ত করে সমরূপে সত্য বলে গণ্য করেছেন। উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টিতত্ত্ব একাধারে অদ্বৈতবাদ এবং পরিণামবাদ উভয়ই। তাই তাকে 'অখণ্ড পরিণামবাদ' বলা যুক্তি যুক্ত। কেননা শ্রীঅরবিন্দের কথাতেই তা পাওয়া যায়। তা হল, "অখণ্ডস্বরূপের প্রত্যয় হতে বহুধা-রূপায়ণের ভাবনায় পরিকীর্ণ হয় তার সংবিতের সহস্ররশ্মি। সে-আলোকে তার সংজ্ঞান তাদাত্ম্যানুভবের আবেশে বিশ্বকে বহুধা-বিচিত্র অদ্বয় তত্ত্বরূপে অনুভব করে, আবার তার প্রজ্ঞান নিজের মধ্যে বিবিক্তরূপে দর্শন করে নিখিল পদার্থকে নিজেরই প্রজ্ঞা ও সঙ্কল্পের বিষয়রূপে। তার অনাদি আত্মসংবিতে এই বিশ্ব এক সত্তা এক চৈতন্য এক দিব্যক্রতু এক স্বরূপানন্দের উল্লাসে স্তব্ধ-তার মধ্যে সমগ্র বিশ্বলীলা একটি অখণ্ড স্পন্দ মাত্র।"[১৬] শ্রীঅরবিন্দের

সৃষ্টিতত্ত্বকে অখণ্ড পরিণামবাদ বলা হলেও তিনি যে তাঁর সৃষ্টি তত্ত্ব আলোচনায় বেদ, উপনিষদ, এবং বেদান্ত দর্শনকে অনুসরণ করেই আলোচনা করেছেন তা একবাক্যে স্বীকার করে নিতে হয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. মজুমদার, শ্রী জিতেন্দ্রচন্দ্র: "শ্রী অরবিন্দের দর্শনে অভিব্যাক্তির স্বরূপ ", *শ্রী অরবিন্দ জন্ম শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.-২২১-২২২
২. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, পৃ. ২৮
৩. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, পৃ. ২৬৯
৪. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, পৃ. ২৭০
৫. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, পৃ.৬৮৯
৬. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, পৃ.১০৭
৭. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, পৃ.২৮-২৯
৮. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, পৃ. ৬৯০
৯. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, পৃ. ৪১
১০. মজুমদার, শ্রী জিতেন্দ্রচন্দ্র: "শ্রী অরবিন্দের দর্শনে অভিব্যাক্তির স্বরূপ ", *শ্রী অরবিন্দ জন্ম শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ.-২২০
১১. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, পৃ. ৮৩
১২. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, পৃ. ৮৪
১৩. রায়, সুনীল: *শ্রী অরবিন্দের দর্শন মন্থনে*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, রাজবাটী, বর্ধমান, পৃ. ২৮
১৪. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, পৃ. ৯৪৯
১৫. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, পৃ. ৯৪
১৬. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, পৃ. ২৩৮-২৩৯

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১. শ্রী অরবিন্দ, *দিব্য জীবন*, অনির্বাণ (অনুবাদক), শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, পন্ডিচেরী, ২০১৩
২. *শ্রী অরবিন্দ জন্ম শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ*, শ্রী সত্যকুমার বসু (সম্পাদক), শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দির, কলকাতা -১২, ১৯৫৯
৩. যোগীন্দ্র, সদানন্দ : *বেদান্তসার*, নৃসিংহ সরস্বতীকৃত *সুবোধিনী*, আপোদেবকৃত *বালবোধিনী*, রামতীর্থযতিকৃত *বিদ্বন্মনোরঞ্জনী*, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য (সম্পাদক), *শ্রীরামকৃষ্ণবেদান্ত* মঠ, কলিকাতা, ১৯৮০
৪. সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, দুর্গাচরণ, *হিন্দুদর্শন* (তৃতীয় অংশ), বাবু শ্রী গোপাল বসু মল্লিকের ফেলোসিপের লেক্চার - চতুর্থ খণ্ড , ভবানীপুর, কলিকাতা, ১৩৩৩
৫. সর্বজ্ঞাত্মমুণি : *সংক্ষেপশারীরক*, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), ষড়্দর্শন প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, উদাসীন সংস্কৃত বিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৮৭
৬. যোগীন্দ্র, সদানন্দ : *বেদান্তসারঃ*, ব্রহ্মচারী মেধা চৈতন্য (সম্পাদক ও অনুবাদক), আদ্যাপীঠ বালকাশ্রম, কলকাতা-৭৬, ২০০৩
সাংখ্য তত্ত্ব কৌমুদী, ডঃ নারায়ন চন্দ্র গোস্বামী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৭. স্বামী,ভাবঘনানন্দ (সম্পাদক), *সাংখ্যসারিকা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলি – ৩,২০০০
৮. —*সাংখ্যসারিকা*, পূর্ণচন্দ্রবেদান্তচুঞ্চু সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ২০০৭
৯. সায়নমাধব : *সর্বদর্শনসংগ্রহঃ*, মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর সম্পাদিত, দি ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্ টাল রিসার্চ ইনিষ্টিইউট্, পুনা, ১৯৫১
১০. সায়ণাচার্যকৃত ভাষ্য, *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*, কাশীনাথ শাস্ত্রী (সম্পাদক), ২ খণ্ড, আনন্দাশ্রম ,পুণা, ১৯৩১, ১৯৭৯